ইউনিট ৫
পোকা দমন

ইউনিট ৫ পোকা দমন

ফসল উৎপাদনে পোকা দমন একটি অপরিহার্য অংশ। আদিকাল থেকে প্রাকৃতিকভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে পোকা দমন হয়ে আসছে। যদি এসব ব্যবস্থা না থাকতো তবে পোকার অত্যাধিক জন্ম ক্ষমতার কারণে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়তো। অতীতের তূলনায় বর্তমানে পোকা দমনে অনেক কলাকৌশল, নীতিমালা ও যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে। কিন্তু এসবের প্রয়োগ এখনও সঠিকভাবে হচ্ছে না। যেমন, শস্য ক্ষেতে অধিক অথবা স্বল্প মাত্রায় অনিয়মিতভাবে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কাঙ্খিত পোকা দমন হয় না বরং পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে, পরিবেশ দূষিত হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং কৃষির Sustainability হ্রাস পায়। পোকা দমন সফল করতে হলে পোকা সম্বন্ধে ধারণা ও সঠিক দমন পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। এ ইউনিটে পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ পোকা দমন পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লিখতে পারবেন।
- পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের উদাহরণ দিতে পারবেন।

দমন পদ্ধতি

পোকার দমন পদ্ধতি প্রধানতঃ দুই প্রকার– যথা, প্রাকৃতিক দমন ও ফলিত বা কৃত্রিম দমন।

আক্রান্ত ক্ষেতের পাশে রাতে মশাল জ্বালালে ধানের গান্ধি পোকা, পাতা শোষক পোকা ও পঙ্গপাল আগুনে পড়ে মারা যায়।

প্রাকৃতিক দমন (Natural control)

১। জলবায়ুগত উপাদান সম হ দ্বারা
২। ভূমি বন্ধুরতা বৈশিষ্ট্য দ্বারা
৩। শিকারী জীব দ্বারা
৪। পোকার রোগ দ্বারা

ফলিত বা কৃত্রিম দমন (Applied or Artificial control)

১। যান্ত্রিক দমন
২। ভৌত দমন
৩। কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ
৪। জৈবিক দমন
৫। রাসায়নিক দমন
৬। কৌলিকভাবে দমন
৭। আইনগত নিয়ন্ত্রণ

প্রাকৃতিক দমন

জলবায়ুগত উপাদানের মধ্যে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলো, বাতাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল উপাদানগুলোর বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন পোকা সহ্য করতে পারে ও বংশ বিস্তার করে থাকে। এসব

উপাদানের পরিবর্তন ঘটলে বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। যেমন, গ্রীষ্মের সময় অত্যধিক তাপমাত্রায় বা খরায় পোকার মৃত্যু ঘটে। অল্প আর্দ্রতায় পাতা শোষক পোকার মৃত্যু ঘটে। আর্দ্রতা বেশি হলে পোকার দেহে ছত্রাকজনিত রোগ বেশি হয় এবং পোকা মারা যায়। প্রবল বায়ুপ্রবাহে মিজ জাতীয় মাছি, কিছু মশক ও উড়ন্ত কীটপতঙ্গ আঘাত পেয়ে মারা যায়। ভূমি বন্ধুরতা যেমন, সমুদ্র, পর্বত, খরস্রোতা নদী, বিশাল অরণ্য প্রভৃতি কীটপতঙ্গের বিস্তারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঁধা সৃষ্টি করে। অনেক শিকারী ও পরজীবি কীটপতঙ্গ, মেরুদন্ডী প্রাণী যথা পাখী, ব্যাঙ, মাছ, বিভিন্ন সরীসৃপ পোকা ধরে খায় এবং পোকার সংখ্যা হ্রাস পায়। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন একটি ব্যাঙ তার পাকস্থলীর ধারণক্ষমতার চারগুণ বেশি পরিমাণ কীটপতঙ্গ ক্ষেতে পারে এবং একটি পাখী প্রায় তার দেহের ওজনের সমান পোকা খেয়ে থাকে। রোগজীবাণু যেমন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি (Nematode) ইত্যাদি পোকার দেহে রোগ সৃষ্টি করে মৃত্যু ঘটায়। এ ছাড়া খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য একই অথবা একাধিক প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার (Inter or intra-specific competetion) ফলে প্রকৃতিকভাবে পোকা দমন হয়। প্রকৃতিতে এরূপে পোকা দমন হয়ে থাকে।

প্রতিদিন একটি ব্যাঙ তার পাকস্থলীর ধারণক্ষমতার চারগুণ বেশি পরিমাণ কীটপতঙ্গ ক্ষেতে পারে এবং একটি পাখী প্রায় তার দেহের ওজনের সমান পোকা খেয়ে থাকে।

ফলিত বা কৃত্রিম দমন

মানুষ কর্তৃক গৃহীত দমন ব্যবস্থাকে কৃত্রিম বা ফলিত দমন বলে। প্রাকৃতিকভাবে দমন কার্যকরী না হলে কৃত্রিমভাবে নিম্নে বর্ণিত দমন ব্যবস্থার প্রয়োগ করতে হয়।

যান্ত্রিক দমন ঃ হাত দ্বারা আহরণ করে পা দ্বারা পিষে মারা। যেমন– পোকার ডিমের গাদা, গুচ্ছ কীড়া এবং দলবদ্ধ অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ পোকা ধরে ধ্বংস করা। হাত জাল ও থলে ব্যবহার করে পোকা মারা যায়। পিটিয়ে মারা যেমন– ঘরের মাছি, তেলাপোকা ইত্যাদি দমন করা সহজ। খুঁচিয়ে মারা যেমন– পোষকের দেহে লুকিয়ে থাকা পোকা লোহার শিক দ্বারা খুঁচিয়ে মেরে দমন করা যায়। কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ভেজা দড়ি আক্রান্ত গাছের উপর টেনে নেয়া এবং গাছ ঝাঁকিয়ে পোকা দমন করা যায়। চালুনি দ্বারা চেলে ও কুলা দ্বারা ঝেড়ে গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমন করা যায়। যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা (Mechanical exclusion) সৃষ্টি করে কীটপতঙ্গের গমনবিধি বন্ধ করলে পোকা দমন হয়। যান্ত্রিক ফাঁদ যেমন– আলোর ফাঁদে পূর্ণাঙ্গ পোকা আকৃষ্ট হয়ে পানিতে পড়ে মারা যায়। পুড়িয়ে যেমন– আক্রান্ত ক্ষেতের পাশে রাতে মশাল জ্বালালে ধানের গান্ধি পোকা, পাতা শোষক পোকা ও পঙ্গপাল আগুনে পড়ে মারা যায়।

ভৌত দমন ঃ অধিক তাপমাত্রা প্রয়োগ করে যেমন– গুদামে ১০-১২ ঘন্টা ৫০° সে. তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে অন্য দিকে আক্রান্ত শস্যদানাকে প্রখর রোদে বিছালে পোকাসমূহ মারা যায়। আর্দ্রতার তারতম্য ঘটিয়ে অর্থাৎ শস্যদানা শুকিয়ে আর্দ্রতা ৮% এর নিচে গুদামজাত করলে অধিকাংশ পোকার আক্রমণ হয় না। শৈত্য প্রয়োগ করে যেমন– গুদামঘর ৫°-১০° সে. তাপমাত্রায় কয়েক ঘন্টা রেখে দিলে অনেক শস্যদানার পোকা দমন হয়। শুষ্ক ফল, সবজি এভাবে রাখলে পোকার আক্রমণ হয় না।

কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে দমন ঃ শস্য ক্ষেতে নিয়মিত পরিচর্যার দ্বারা কীটপতঙ্গের ক্ষতি থেকে ফসলকে মুক্ত রাখা সম্ভব। বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যা যেমন– জমি কর্ষণ, আগাছা দূরকরা, ক্ষেত পরিস্কার রাখা, শস্য বপন ও রোপণের তারিখ পরিবর্তন, ক্ষেতে পানি সিঞ্চন বা নিষ্কাশন, শস্য ছাটাই ও পাতলাকরণ, পরিমিত ও সঠিক সার প্রয়োগ, ফাঁদ শস্য রোপণ, শস্য পর্যায় (Crop rotation) এবং পোকা প্রতিরোধকজাত চাষের মাধ্যমে পোকা দমন হয়ে থাকে।

জৈবিক দমন ঃ এই পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শত্রুসমূহ যেমন পরভোজী (Predator), পরজীবি (Parasitoid) এবং রোগজীবাণু (Pathogen) কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয়। অনেক পোকা আছে যারা পরজীবি ও পরভোজী হিসাবে অন্য পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। রোগজীবাণুর মধ্যে অনেক ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও কৃমি সফলভাবে পোকার জৈবিক দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাসায়নিক দমনঃ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাধ্যমে কীটপতঙ্গ দমন করা হয়। এসব দ্রব্যাদির মধ্যে কীটনাশক (Insecticide), আকর্ষক (Attractant), বিকর্ষক (Repellent), হরমোন ও খাদ্যনিরোধক (Antifeedant) উল্লেখযোগ্য। নানা প্রকারের কীটনাশক পোকা দমনে ব্যবহার করা হয়। এগুলোর বর্ণনা এই ইউনিটের পাঠ ৫.২ এ পাওয়া যাবে। আকর্ষকের মধ্যে ফেরোমোন কৃত্রিমভাবে তৈরি করে পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায়। বিকর্ষক কীটপতঙ্গকে নিরুৎসাহ, এড়িয়ে চলার প্রবণতা, অনাগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভৌত বিকর্ষক যেমন, পানি, ধূলা, মোম, ধূঁয়া ইত্যাদি রাসায়নিক বিকর্ষক যথা বিটা-ন্যাপথল, সাইট্রোনিল তৈল, আলকাতরা ইত্যাদি এবং ভেষজ বিকর্ষক যেমন নিম, বিষকাটালী, নিশিন্দা ইত্যাদি পোকা দমনে ব্যবহার করা যায়। হরমোন কীটপতঙ্গ দমনের একটি আধুনিক পদ্ধতি। কৃত্রিম হরমোন যেমন, এলটুসিড, ডিমিলিন ইত্যাদি আক্রান্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে কীটপতঙ্গ সরাসরি মরে না কিন্তু বৃদ্ধি ব্যহত হয়, বিকলাঙ্গ, স্বল্পায়ু, প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে দমন করা যায়। খাদ্যনিরোধক কীটপতঙ্গকে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণে বিরত রাখে। ট্রাইফিনাইল কার্যকরী খাদ্যনিরোধক এবং উদ্ভিদজাত কীটনাশক, যেমন– নিমের নির্যাস খাদ্য নিরোধের কাজ করে।

কৌলিকভাবে দমনঃ গামা রশ্মি (Gamma radiation) প্রয়োগে কীটপতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে এবং পোকার সংখ্যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে পুরুষ পোকাগুলোকে গামা রশ্মির মাধ্যমে বন্ধ্যা করে স্ত্রী পোকাগুলোর সহিত স্বাভাবিক যৌন মিলনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এদের মিলনের ফলে যে ডিম হয় সবটিই বন্ধ্যা হয় এবং বাচ্চা হয় না। বন্ধ্যাকরণ রাসায়নিক দ্রব্য (Chemosterilant) ব্যবহার করেও এই প্রক্রিয়ায় পোকা দমন করা যায়।

কোনো ক্ষতিকর পোকা কোনো দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইনগতভাবে বাঁধা প্রদান করা হয়।

আইনগত নিয়ন্ত্রণ ঃ কোনো ক্ষতিকর পোকা কোনো দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইনগতভাবে বাঁধা প্রদান করা হয়। আক্রান্ত গাছের অংশ ও বীজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচলে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে অনেক পোকা ও রোগের ব্যাপক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই দমন পদ্ধতিকে কোয়ারেন্টাইন দমন বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন সামুদ্রিক বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সীমান্ত এলাকায় আইনগত পোকা দমনের ব্যবস্থা আছে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ বর্তমানে আপদ দমনে কোন্ কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা বর্ণনা করুন।*

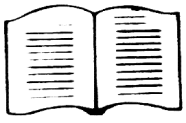

সারমর্মঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোকা দমন করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে পোকা দমন সর্বদা কম বেশি হয়ে থাকে। এই দমন পদ্ধতিতে জলবায়ুর তারতম্য ও প্রাকৃতিক শত্রু অধিক ভূমিকা পালন করে। ফলিত দমন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের এবং সবগুলো পদ্ধতি একই পোকার উপর প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো পোকা দমনে একাধিক ফলিত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যান্ত্রিক দমন, কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও রাসায়নিক দমন যথা কীটনাশকের ব্যবহার সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতি। ভৌত দমন গুদামজাত শস্যদানা পোকার জন্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। জৈবিক, কৌলিক ও আইনগত দমন পদ্ধতির জন্য বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন পড়ে। এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করলে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। সহজ উপায়ে, কম খরচে ও পরিবেশ দূষিত না করে পোকা দমন করতে হলে যান্ত্রিক ও কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে পোকা দমন পদ্ধতি কীটনাশক প্রয়োগ অপেক্ষা উত্তম।

জৈবিক দমন পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শত্রুসমূহ যেমন পরভোজী, পরজীবি এবং রোগজীবাণু কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. যান্ত্রিক দমন বলতে কী বুঝায়?

i) হাত দ্বারা ধ্বংস করা
ii) কীটনাশক প্রয়োগ
iii) গরম পানিতে মারা
iv) জমি কর্ষণ

খ. কোন্ পোকার প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে কৌলিকভাবে দমন করা যায়?

i) শুককীট
ii) পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা
iii) পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা
iv) পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ পোকা

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. সাফল্যজনকভাবে পোকা দমন করতে হলে পোকা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

খ. আইনগত নিয়ন্ত্রণে আক্রান্ত চারা অনুপ্রবেশে বাঁধা দেয়া হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. জৈবিক দমনে পরজীবি প্রাণী হিসেবে ..... ব্যবহৃত হয়।

খ. রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে ..... বেশি প্রয়োগ করা হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ অবস্থায় কৃত্রিম দমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়?

খ. কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে দমন বলতে কী বুঝায়?

পাঠ ৫.২ রাসায়নিক কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ ও বর্ণনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- রাসায়নিক কীটনাশকের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- রাসায়নিক কীটনাশকের শ্রেণিবিন্যাস জানতে পারবেন।
- সচরাচর ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিক কীটনাশকের বর্ণনা দিতে পারবেন।

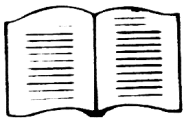

রাসায়নিক কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ

যেসব বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলে অথবা দমনের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে কীটনাশক (Insecticide) বলে। বিভিন্নভাবে কীটনাশক সমূহকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

ক. রাসায়নিক প্রকৃতি ও উৎসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস
   ১। অজৈব কীটনাশক
   ২। জৈব কীটনাশক
      ক. জৈব ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন অথবা জৈব ক্লোরিন
      খ. জৈব ফসফরাস
      গ. জৈব কার্বামেট
      ঘ. পাইরিথ্রয়েড

খ. কার্যপ্রকৃতির (Mode of action) উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস
   ১। পাকস্থলী বিষ (Stomach poison)
   ২। সংস্পর্শ বিষ (Contact poison)
   ৩। প্রবাহ বিষ (Systemic poison)
   ৪। সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ (Contact poison with local penetration properties)
   ৫। বিষবাষ্প বা শ্বাস বিষ (Fumigant)

অজৈব কীটনাশক ঃ এ কীটনাশক প্রাথমিক কীটনাশক বলে বিবেচিত হয়। এই প্রকারের কীটনাশক কার্বন ধারণ করে না। কেবলমাত্র একাধিক ধাতুর সমন্বয়ে অজৈব কীটনাশক তৈরি হয়। যেমন, মারকিউরিক ক্লোরাইড, লেড আর্সিনেট ইত্যাদি। কার্যপ্রকৃতি সাধারণত পাকস্থলী বিষ বা ভক্ষণ বিষ হয়ে থাকে। জৈব কীটনাশকের আবিস্কার ও ব্যবহার শুরু হলে অজৈব কীটনাশক তৈরি রহিত হয়।

এই প্রকার কীটনাশক প্রধানত ক্লোরিনের পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা কার্বন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত থাকে।

জৈব ক্লোরিন ঃ জৈব কীটনাশকের মধ্যে জৈব ক্লোরিন কীটনাশক সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয়। এই প্রকার কীটনাশক প্রধানত ক্লোরিনের পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা কার্বন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত থাকে। এই প্রকারের কীটনাশক পানিতে অদ্রবনীয় এবং অনেক দিন পর্যন্ত কীটপতঙ্গের শরীরে জমা থকে। বিষক্রিয়ার স্থায়িত্ব (Residual action) কাল অনেক বেশি। এ কারণে জৈব ক্লোরিণ জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহার বর্তমানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল কীটনাশক সিক্তযোগ্য গুঁড়া (Wettable powder), তরল (Emulsifiable concentrate) এবং অ্যারোসল আকারে বাজারজাত করা হয়। যেমন, ডিডিটি, ডাইএলড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডান, অলড্রিন ইত্যাদি।

জৈব ফসফরাস ঃ এই প্রকারের কীটনাশক ফসফরাসের পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা সরাসরি কার্বন পরমাণুর সংগে অথবা পরোক্ষভাবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা সালফার এর মাধ্যমে যুক্ত থাকে। জৈব ফসফরাস কীটনাশকের সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর কীটনাশকের চেয়ে অনেকগুন বেশি। কোনো কোনো

কীটনাশকে একাধিক ক্রিয়ার ধরন থাকে যার ফলে একটি কীটনাশক দ্বারা কয়েকটি মাঠ ফসলের পোকা দমন করা যায়। পাকস্থলী ও সংস্পর্শ বিষ কীটনাশকগুলো প্রবাহ বিষ, সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ এবং বিষ বাষ্প হিসেবে কাজ করে। জৈব ফসফরাস কীটনাশক সহজে পানিতে দ্রবনীয় এবং বিষক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী থেকে স্বল্প দীর্ঘকাল স্থায়ী। মাঠ ফসল গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমনে এই প্রকার কীটনাশক বেশি ব্যবহার করা হয়। জৈব ফসফরাস কীটনাশকের ফর্মূলেশন (আকার) নানা প্রকারের হয়ে থাকে। ডাইমেক্রন, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন, ভ্যাপোনা, সুমিথিয়ন, ডিপটেরেক্স ইত্যাদি কীটনাশক জৈব ফসফরাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

জৈব কার্বামেট ঃ কার্বনিক এসিড এস্টার এই প্রকারের কীটনাশকে থাকে। জৈব ফসফরাসের মত কাজ করে এবং সংখ্যায় কম হলেও কতকগুলো কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিতে ব্যাপক। জৈব কার্বামেট কীটনাশক সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও দানাদার ফর্মুলেশন হিসেবে পাওয়া যায়। সেভিন, ফুরাডান ইত্যাদি জৈব কারবামেট কীটনাশক।

গুণাবলীর দিক থেকে গুদাম-জাত শস্যদানার পোকা দমনে পাইরিথ্রয়েড ভালো কাজ করে।

পাইরিথ্রয়েড ঃ এই প্রকারের কীটনাশকের উৎস ছিল চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় (ক্রিসানথিমাম) ফুল। পরবর্তীতে কারখানার সংশ্লেষিত পাইরিথ্রয়েড কীটনাশক প্রাপ্তি শুরু হলো। গুণাবলীর দিক থেকে গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমনে পাইরিথ্রয়েড ভালো কাজ করে। কিছু শাক-সবজির পোকাও সহজে নিয়ন্ত্রন করা যায়। বিষক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হলেও মাছের জন্য পাইরিথ্রয়েড কীটনাশক খুব মারাত্মক।

সচরাচর ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক

ডাইমেক্রন ঃ এই কীটনাশকের সাধারণ নাম ফসফামিডন। এর বাণিজ্যিক নাম ডাইমেক্রন। এর ক্রিয়ার ধরন সংস্পর্শ, পাকস্থলী ও প্রবাহমান বিষ। ইহা তৈল ও পানিতে দ্রবনীয় ও রাসায়নিকভাবে স্থায়ী এবং গাছের যে অংশের সংস্পর্শে লাগে, সেই অংশের ভিতর ঢুকে এবং কোষ রসের সংগে মিশ্রিত হয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। ইহার বিষাক্ততা তিন সপ্তাহ স্থায়ী থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহা ধান, পাট ও আমগাছের পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। এই কীটনাশক ১০০ ইসি (তরল) রূপে পাওয়া যায়।

ডায়াজিনন ঃ এর বাণিজ্যিক নাম বাসুডিন ও ডায়াজিনল। এর ক্রিয়ার ধরন হলো সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ প্রকৃতির। ইহার বিষাক্ততা এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ফসলের মাজরা পোকা দমনে খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া গাছের উপরের পোকাও দমন হয়ে থাকে। ইহা তরল ও দানাদার আকারে পাওয়া যায়।

ম্যালাথিয়ন নিরাপদে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায় এবং খাদ্য শস্য, গুদামজাত শস্যদানা এবং শাক-সবজিতে কোনো বিষক্রিয়া থাকে না।

ম্যালাথিয়ন ঃ এই কীটনাশক যিথিওল, ফাইফানল এবং আরও অনেক বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়। প্রধানত সংস্পর্শ বিষ তবে বিষবাষ্প ক্ষমতাও আছে। ইহা নিরাপদে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায় এবং খাদ্য শস্য, গুদামজাত শস্যদানা এবং শাক-সবজিতে কোনো বিষক্রিয়া থাকে না। বিভিন্ন প্রকারের পোকা দমনের জন্য মাঠে, গুদামঘরে এমনকি গৃহপালিত পশু-পাখীর উপর ব্যবহার করা যায়। ম্যালাথিয়ন কীটনাশকের বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্ব অত্যন্ত কম ৩-৫ দিন কার্যকরী থাকে। ইহা তরল ও গুঁড়া (Dust) রূপে পাওয়া যায়।

ভ্যাপোনা ঃ ইহার সাধারন নাম ডাইক্লোরভস এবং বাণিজ্যিক নাম নগজ, ডিডিভিপি, নুভান। ইহা সংস্পর্শ ও বিষবাস্প বিষ এবং অত্যন্ত বিষাক্ত বলে অনেক পোকা দমনে প্রয়োগ করা হয়। শাক-সবজি, গুদামজাত শস্যদানা পোকা ও মশা এবং মাছি দমনে অত্যন্ত কার্যকরী কীটনাশক। স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্যও অত্যন্ত মারাত্মক। বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্ব অত্যন্ত কম কার্যকারীতা ২-৩ দিন। ইহা তরল আকারে পাওয়া যায়।

সুমিথিয়ন ঃ ইহার বাণিজ্যিক নাম একোথিয়ন, ফেনোট্রিথিয়ন, ফলিথিয়ন ইত্যাদি। ইহা সংস্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ এবং ব্যাপক সংখ্যক পোকার দমনে ব্যবহার করা যায়। ইহার বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্ব প্রায় ১২-১৪ দিন। তরল আকারে পাওয়া যায়।

ডিপটেরেকস ঃ ইহার বাণিজ্যিক নাম ডিপাটেরেক্স, ডাইলকস, নেগুভন ইত্যাদি। ইহা সংস্পর্শ ও স্থানীয় প্রবেশ বিষ এবং পাকস্থলী বিষ। ইহা ফলের মাছি পোকা দমনে বিশেষভাবে কার্যকরী। ইহা সিক্তগুঁড়া আকারে পাওয়া যায়।

সেভিন ঃ ইহাকে কারবারিল বলে। সংস্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ এবং স্বল্পভাবে প্রবাহ বিষ হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন প্রকারের ফসলের পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের পোকাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গুদামজাত শস্যের পোকাও দমন করা যায়। ইহা সিক্তগুঁড়া ও গুঁড়া আকারে পাওয়া যায়। বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্বকাল ৫-৮ দিন।

ফুরাডান ঃ সাধারণ নাম কারবোফুরান। সংস্পর্শ ও পাকস্থলী বিষ। ইহা কেবল কীটনাশক নয়। মাকড়নাশক ও নেমাটোড বা কৃমিনাশকেরও কাজ করে। ধানের মাজরাপোকা সহ অন্যান্য পোকা দমনে ব্যবহার করা হয়। ইহা দানাদার রূপে পাওয়া যায়।

ফুরাডান কেবল কীটনাশক নয়। মাকড়নাশক ও নেমাটোড বা কৃমিনাশকেরও কাজ করে।

সাইপারমেথ্রিন ঃ পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক। বাণিজ্যিক নাম রিপকর্ড, সিমবুশ ইত্যাদি। আমের হপার, তূলার গুটি পোকা প্রভৃতি দমনের জন্য অনুমোদিত। তরল আকারে পাওয়া যায়।

অনুশীলন (Activity) ঃ *সচরাচর যে সব আপদনাশক ব্যবহার করা হয় তাদের একটা তালিকা তৈরি করুন। আপনার এলাকায় কী কী কীটনাশকের ব্যবহার বেশি তা কারণ সহ লিখুন।*

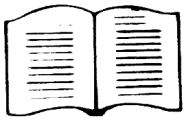

সারমর্ম ঃ রাসায়নিক কীটনাশকের বিষাক্ততার কারণে পোকা মরে এবং ইহার দ্বারা দ্রুতবেগে পোকা দমন করা যায়। সবগুলো রাসায়নিক কীটনাশক কারখানায় তৈরি হয় এবং এদের শ্রেণিবিভাগ রাসায়নিক প্রকৃতি ও বিষক্রিয়ার ধরনের উপর নির্ভর করে। ক্রমাগত বিভিন্ন কীটনাশক আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে জৈবিক কীটনাশক পোকা দমনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে বেশি। বিভিন্ন প্রকারের কীটনাশকের মধ্যে জৈব ফসফরাস কীটনাশকের গুণগত মান বেশি থাকায় কৃষি ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পোকা দমনে এই শ্রেণীর কীটনাশকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। কতগুলো রাসায়নিক কীটনাশক অত্যন্ত বিষাক্ত ও এদের স্থায়িত্বকাল বেশি থাকে। আবার কতকগুলো কীটনাশকের বিষক্রিয়ার ধরন একাধিক এবং অনেক প্রকারের পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৫.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. কীটপতঙ্গ দমনের জন্য নিম্নের রাসায়নিক দ্রব্যাদির কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়?
র) মাকড়নাশক রর) কৃমিনাশক
ররর) ইঁদুরনাশক রা) কীটনাশক

খ. হেপটাক্লোর কোন্ শ্রেণীর কীটনাশক?
র) জৈব ক্লোরিন রর) জৈব ফসফরাস
ররর) জৈব কার্বামেট রা) পাইরিথ্রয়েড

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. লেড আর্সিনেট এক প্রকার অজৈব কীটনাশক।
খ. ডাইমেক্রন স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মাজরা পোকা দমনে ..... ভালো কাজ করে।
খ. শাক সবজির পোকা দমনে ..... ব্যবহার করা নিরাপদ।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ প্রকারের কীটনাশক পানিতে অদ্রবনীয়?
খ. কোন্ শ্রেণীর কীটনাশকের বিষক্রিয়ার স্থায়ীত্বকাল বেশি?

পাঠ ৫.৩ কীটনাশক ব্যবহার ও সতর্কতা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটনাশক ব্যবহারের নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- কীটনাশক ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতির ধারণা জানতে পারবেন।
- কীটনাশক ব্যবহারকালীন করণীয় সতর্কসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

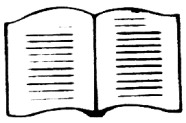

কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি

সাফল্যজনক পোকা দমন যেমন কীটনাশকের কার্যকারীতা ও সময়মত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে তেমন কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতিরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি নির্বাচনকালে শস্য, পোকার প্রকৃতি, স্থানীয় অবস্থা ও ব্যয় প্রভৃতি লক্ষ্যনীয়। গাছে, গুদামঘরে অথবা অন্য কোথাও কীটনাশক এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন পোকার সংস্পর্শে আসে। এজন্য উপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

সিঞ্চণ পদ্ধতি (Spraying)

পানিতে কীটনাশকের মিশ্রণ সিঞ্চণ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্দু বিন্দু আকারে ছড়ানোকে সিঞ্চণ পদ্ধতি বলে।

সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও তরল কীটনাশক ব্যবহারে সিঞ্চণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পানিতে কীটনাশকের মিশ্রণ সিঞ্চণ যন্ত্রের সাহায্যে বিন্দু বিন্দু আকারে ছড়ানোকে সিঞ্চণ পদ্ধতি বলে। সাধারণত সিঞ্চণ প্রয়োগ সুবিধার্থে বাহক তরলের (পানি) পরিমাণের উপর ভিত্তি করে উচ্চ ঘনফল, নিম্ন-ঘনফল এবং সর্বনিম্ন-ঘনফল সিঞ্চণ এ তিন পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চ-ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তরল মিশ্রণ উচ্চ চাপের দ্বারা সিঞ্চণ যন্ত্রের পাইপের অগ্রভাগ দিয়ে বিন্দু আকারে বের হয়। বিন্দুগুলোর আকার ১৫০ মাইক্রন অথবা অধিক। এই পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণ তরল মিশ্রণ বা সিঞ্চণ মিশ্রণ প্রয়োজন হয়। মাঠের ছোট ফসল যেমন ধান, শাক-সবজি, তূলা প্রভৃতির জন্য প্রতি একরে ১০০ গ্যালন সিঞ্চণ মিশ্রণ লাগে এবং বড় ফসল যেমন ইক্ষুর ক্ষেত্রে উচ্চ ঘনফল সিঞ্চণ যন্ত্র দিয়ে সিঞ্চণ করলে প্রতি একরে সিঞ্চণ মিশ্রণ লাগবে ১৫০ গ্যালন। সিঞ্চণ যন্ত্রের ট্যাংক সুবিধাজনকভাবে বড় হতে হবে। কোনো কোনো সময় সিঞ্চণ যন্ত্র ট্রাকটরের সংগে যুক্ত করে সিঞ্চণ কাজ করতে হয়। সাধারণ সিঞ্চণ যন্ত্র যেমন হস্তচালিত সিঞ্চণ যন্ত্র এ পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়। নিম্ন ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতিতে কীটনাশকের মাত্রা ঠিক থাকে কিন্তু প্রতি একরে তরল মিশ্রণ কম লাগবে। উচ্চ চাপের ফলে সিঞ্চণ যন্ত্র থেকে মিশ্রণ ১৫০ মাইক্রনের চেয়ে কম আকারের বিন্দুসমূহ বের হবে। মিষ্ট ব্লায়ার এর মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। সর্বনিম্ন ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতিতে কীটনাশক পানিতে মিশ্রিত করার প্রয়োজন হয় না। কীটনাশক সরাসরি পরিমাণমত জমিতে ছিটানো সম্ভব। বিমান বা হেলিকপ্টার দিয়ে আকাশ থেকে এই পদ্ধতিতে কীটনাশক ছিটানো যায় ইহাকে এরিয়াল স্প্রেইং বলে। এখানে অত্যধিক চাপের ফলে কীটনাশক ভেঙ্গে ৭০ মাইক্রন বিন্দুতে কুয়াশার ন্যায় পড়ে। সর্বনিম্ন ঘনফল সিঞ্চণ পদ্ধতির মাধ্যমে ধানের শীষকাটা লেদাপোকা, পামরি পোকা, গান্ধিপোকা ইত্যাদি যখন মড়ক আকারে শস্য ক্ষেতে দেখা যায় তখন বিমান দ্বারা কীটনাশক ছিটিয়ে দমন করা হয়। শহর এলাকায় ব্যাপক হারে মশা দমনে, বিস্তীর্ণ বনে এবং যেখানে স্থলভাগে প্রয়োগ সম্ভব নয় এসব স্থানে এরিয়েল স্প্রেইং করা হয়।

গুঁড়া ছড়ান (Dusting)

গুঁড়া ছড়ান পদ্ধতিতে কীটনাশক গুঁড়া অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। পানির পরিবর্তে সূক্ষ্ম বালি অথবা করাতের গুঁড়া কীট-নাশকের সংগে মিশিয়ে ছড়ান যায়।

এই পদ্ধতিতে কীটনাশক গুঁড়া অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। পানির পরিবর্তে সূক্ষ্ম বালি অথবা করাতের গুঁড়া কীটনাশকের সংগে মিশিয়ে ছড়ান যায়। ডাষ্টার নামক যন্ত্র গুঁড়া ছড়ান কাজে উপযোগী। যেখানে পানির অভাব সেখানে এই পদ্ধতি সিঞ্চণ পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। শস্য ক্ষেতে গুঁড়া কীটনাশক ছড়ানোর সময় শান্ত আবহাওয়া থাকা বাঞ্ছণীয় এবং সকালবেলা এ কাজের জন্য উপযুক্ত সময়। উক্ত সময়ে গাছের পাতার শিশির গুঁড়া কীটনাশক ধরে রাখে, ফলে কীটনাশক গাছের নিচে পড়ে অপচয় হয় না। গুদামঘরের ফাটলে, বৃহৎ পরিমাণ গুদামজাত শস্যদানার উপর এবং বস্তার

স্তুপের উপর গুঁড়া কীটনাশক ছড়ান হয়। অল্প পরিমিত শস্যদানা ও বীজ সংরক্ষণে পোকার প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার জন্য সাধারণভাবে কীটনাশক গুঁড়ার মিশ্রণ মিশিয়ে ব্যবহার হয়।

বিষবাষ্প প্রয়োগ (Fumigation)

এ পদ্ধতিতে কীটনাশক বিষবাষ্পরূপে কঠিন ও তরল অবস্থায় বিশেষ করে বদ্ধ স্থানে ব্যবহার করা হয়। পোকা দীর্ঘ সময় বিষাক্ত গ্যাস অর্থাৎ বিষবাষ্পের সংস্পর্শে থেকে মারা যায়। গুদামজাত শস্যদানার পোকা দমনে এটি একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি। পোকা কর্তৃক আক্রান্ত শস্যদানা বিশেষ কক্ষে অথবা গ্যাস প্রতিরোধক বড় আস্তরণের ভিতরে রেখে বিষবাষ্প ব্যবহার করা হয়। প্ল্যান্ট কোয়ার‍্যান্টাইন স্টেশনে এবং খাদ্যশস্য ও বীজের গুদামঘরে বিষবাষ্প প্রয়োগ করা হয়। বিষবাষ্প হিসেবে ফসটক্সিন ট্যাবলেট প্রতি টন শস্যদানা অথবা বীজের জন্য ২টি ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়। তরল বিষবাষ্প যেমন ইডিসিটি, মিথাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি বদ্ধস্থানে ব্যবহার করা যায়। মশা ও মাছি দমনে কঠিন ও তরল বিষবাষ্প যথাক্রমে কয়েল ও কেন্ডেল এবং এরোসল ঘরে ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে কয়েল ও কেন্ডেল আগুনে জ্বালাতে হয় এবং সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাস শ্বাসনালীর ভিতরে ঢুকে পোকাকে মেরে ফেলে। এরোসল চাপ দিয়ে অথবা পাত্র খুলে ব্যবহার করতে হয়। চাপের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় তরলে দ্রবীভূত এরোসলের বিষ চাপ মুক্ত হলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পোকা মারা যায়।

প্ল্যান্ট কোয়ার‍্যান্টাইন স্টেশনে এবং খাদ্যশস্য ও বীজের গুদামঘরে বিষবাষ্প প্রয়োগ করা হয়।

দানাদার প্রয়োগ (Granules application)

কীটনাশক দানাদার আকারে জমিতে ব্যবহারকে দানাদার প্রয়োগ বলে। বীজোৎপন্ন শস্যে প্রবাহমান জৈব ফসফরাস ও জৈব কার্বামেট কীটনাশক দানাদাররূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত মাটিতে কীটনাশক এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। ধানের মাজরা পোকা দমনে কীটনাশকের এই পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে অনেক বেশি। দানাদার কীটনাশক যেমন ডায়াজিনন ১০ডি, ফুরাডান ৩জি সরাসরি পানিযুক্ত জমিতে হাত দিয়ে ছড়ান যায়। দানাদার কীটনাশক ছড়ান যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপণের সময় সারিতেও প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া হাত দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটিতে মিশানো যেতে পারে। তবে মাটিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। দানাদার কীটনাশক প্রয়োগের প্রধান উপকার হচ্ছে যে, ব্যাপকহারে মাটি দুষণের বিপদ কম এবং ব্যবহারকারীর বিপদ নগন্য।

বিষটোপ (Poison bait)

মাটিতে অবস্থানকারী পোকা যেমন কাটুই পোকা, উঁড়চুঙ্গা, উঁই পোকা, পিঁপড়া, ধানের শীষকাটা লেদাপোকা, তেলাপোকা ইত্যাদি বিষটোপের দ্বারা দমন করা যায়। চারটি উপাদান যেমন– নিষ্ক্রিয় বস্তু (গমের ভূষি, চালের কুড়া), আকর্ষক (চিনি, গুড় অথবা শাক-সবজির তেল), কীটনাশক এবং পানি বিষটোপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলো মিশিয়ে টোপ তৈরি করে সুড়ঙ্গে বা ক্ষেতে হাত দ্বারা রাখতে হয়। রাতে ঐসব পোকা সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে টোপ খায় অথবা ভিতরে টেনে নিয়ে খায় এবং পোকা মারা যায়। বিষটোপের আকর্ষক বস্তু সহজে পোকাকে টোপের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং একাধিক পোকা একটি টোপে মরতে পারে। কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে বিষটোপ একটি উত্তম পদ্ধতি। মিষ্টি কুমড়ার গুঁড়া, পানি ও কীটনাশক একত্রে মিশিয়ে এই বিষটোপ তৈরি করতে হয়। আক্রান্ত গাছের নিকটে একটি পাত্রে বিষটোপ রেখে দিলে মাছি পোকা আকৃষ্ট হয়ে খেয়ে মারা যায়।

কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে বিষটোপ একটি উত্তম পদ্ধতি। মিষ্টি কুমড়ার গুঁড়া, পানি ও কীটনাশক একত্রে মিশিয়ে এই বিষটোপ তৈরি করতে হয়।

কীটনাশক ব্যবহারে সতর্কতা

প্রত্যেক কীটনাশক কম বেশি বিষাক্ত। সাধারণভাবে সাবধানতা অবলম্বনসহ অনুমোদিত সতর্কমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করলে অথবা অবহেলা করলে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই প্রতিটি কীটনাশক ব্যবহারে সতর্কতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

ক. কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে সতর্কতা

কীটনাশক পাত্রের গায়ে লিখিত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১। কীটনাশক পাত্রের গায়ে লিখিত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

২। অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।

৩। হাতে রবারের গ্লোবস লাগিয়ে কাঠ বা বাঁশের শলাকা দিয়ে মিশ্রণকে উত্তমভাবে নাড়তে হবে।

৪। এক কীটনাশকে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অন্য কীটনাশকে ব্যবহার করার পূর্বে পানিতে ভালোরূপে ধুয়ে নিতে হবে যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটে।

৫। ব্যবহারকারীর শরীরে কোনো প্রকার ক্ষত, খোস-পাঁচড়া বা কোনো প্রকার চর্মরোগ থাকতে পারবে না। এমনকি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কীটনাশক ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না।

খ. কীটনাশক ব্যবহারকালীন সতর্কতা

কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় অতিরিক্ত কাপড় বা এপ্রোন পড়ে নিতে হবে এবং নাক, মুখ ও চোখ কীটনাশকের বিষাক্ত বাষ্প থেকে রক্ষার জন্য মুখোস ব্যবহার করতে হবে।

১। কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় অতিরিক্ত কাপড় বা এপ্রোন পড়ে নিতে হবে এবং নাক, মুখ ও চোখ কীটনাশকের বিষাক্ত বাষ্প থেকে রক্ষার জন্য মুখোস ব্যবহার করতে হবে।

২। সব সময় বায়ু প্রবাহের অনুকূলে কীটনাশক সিঞ্চণ করতে হবে এবং প্রখর রোদে সিঞ্চণ নিষিদ্ধ।

৩। কীটনাশক ব্যবহারের সময় সর্ব প্রকারের পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। নজেল ক্যাপের ছিদ্র বন্ধ হলে কখনও মুখের দ্বারা ফুঁ দিয়ে পরিস্কার করা যাবে না।

৫। শস্য গাছে ফুল ধরলে কীটনাশক প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা মৌমাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ যারা পরাগায়নে সাহায্য করে তারা মারা যাবে।

৬। পুকুর, খাল ও নালার নিকট কীটনাশক প্রয়োগে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এমনকি এসব জলাশয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ধোয়াও চলবে না। এছাড়া কোনো পশু-পাখীর খামারের নিকট কীটনাশক প্রয়োগের সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

৭। পরিপক্ক ফসলে অল্প মেয়াদী কীটনাশক ছাড়া অন্য কীটনাশকের ব্যবহার চলবে না।

৮। কীটনাশক ব্যবহারকারীকে প্রতিদিন ছয় ঘন্টার বেশি কাজ করতে দেয়া যাবে না।

গ. কীটনাশক ব্যবহারের পর সতর্কতা

১। কীটনাশক ব্যবহারকারীকে কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে যন্ত্রপাতি ধৌত করে যথাস্থানে রেখে দিতে হবে।

২। সিঞ্চণ যন্ত্রের পানি বা অবশিষ্টাংশ কীটনাশক নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে।

৩। কীটনাশক ব্যবহৃত জমিতে হুসিয়ারী সাইন বোর্ড টানাতে হবে যাতে করে অত্র এলাকার কৃষক, রাখাল ও পথচারী নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে।

যদি কোনো কারণে কীটনাশক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ফেলে, তবে তৎক্ষণাৎ বমন করাতে হবে। উষ্ণ লবণ খাইয়ে অথবা গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমন করানো যায়।

৪। কীটনাশক ব্যবহারের শেষে ব্যবহারকারীকে গায়ের কাপড় খুলে সাবান দ্বারা হাত মুখ ধুয়ে বা গোসল করে নিতে হবে।

৫। কীটনাশকের পাত্র পরিস্কার করে কীটনাশকের নাম লিখে গুদামে রাখতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া গুদামঘর সব সময় তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

৬। কোনোক্রমেই কীটনাশকের খালি পাত্রে খাদ্য দ্রব্য বা পানি রাখা যাবে না।

৭। যদি কোনো কারণে কীটনাশক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ফেলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাতে হবে। উষ্ণ লবণ খাইয়ে অথবা গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমন করা যায়। অচেতন রোগীকে বমন করে যতশীঘ্র ডাক্তারের চিকিৎসাধীন নিতে হবে।

৮। শ্বাসের সংগে কীটনাশক ভিতরে গেলে রোগীকে মুক্ত আবহাওয়ায় নিতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তার ডাকতে হবে।

৯। চর্মের উপর কীটনাশক লাগলে সংগে সংগে পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। চর্ম যদি আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্য যদি দৈহিক কোনো রোগ দেখা দেয় তবে অবিলম্বে ডাক্তারকে দেখানো উচিত।

১০। চক্ষু কীটনাশক দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রথমে চক্ষুর উপরিভাগ পানি দিয়ে ধুঁয়ে তারপর সম্পূর্ণ চক্ষুটাই প্রচুর পানিতে ধুঁয়ে দিতে হবে। পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার এলাকায় কী ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা বর্ণনা করুন। কীটনাশক ব্যবহারের সময় প্রয়োগকারীর কী করা উচিত?*

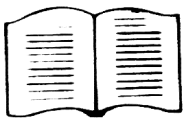

সারমর্ম ঃ কীটনাশক স্থল ও আকাশ থেকে প্রয়োগ করা হয়। সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও তরল কীটনাশক সিঞ্চণ যন্ত্রের চাপের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন ঘনফল পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শস্যের জমি ও বিভিন্ন স্থানে পোকা দমনে কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়। সাধারণত গুঁড়া ও বিষবাষ্প জাতীয় কীটনাশক আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করা হয়। দানাদার ও বিষটোপ প্রয়োগের জন্য বিশেষ কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এ প্রকারের কীটনাশকের ব্যবহার খুব সীমিত। কীটনাশক বিষাক্ত বলে ব্যবহারের পূর্বে ও পরে নানাভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তাছাড়া দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. পানিতে মিশিয়ে কোন্ কীটনাশক ব্যবহার করা হয়?
র) গুঁড়া
রর) বিষবাষ্প
ররর) সিক্তযোগ্য গুঁড়া ও তরল
রা) বিষটোপ

খ. গুঁড়া কীটনাশক ব্যবহারের উপযুক্ত স্থান কোন্‌টি?
র) শস্য ক্ষেতে
রর) শাক-সবজির ক্ষেতে
ররর) গুদামঘরে
রা) যে স্থানে প্রচুর পানি পাওয়া যায়।

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. বিষবাষ্প প্রয়োগের সুবিধাজনক স্থান হলো ছোট মাঠ।
খ. বায়ূর অনুকূলে কীটনাশক প্রয়োগ করা নিরাপদ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বিষটোপ তৈরির সময় কীটনাশক ছাড়া ..... কার্যকরী।
খ. চর্মের উপর কীটনাশক লাগলে ..... ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কীটনাশক ব্যবহার নির্বাচনের সময় কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে?
খ. কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে কঠোরভাবে কী পালন করতে হয়?

পাঠ ৫.৪ সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা জানতে পারবেন।
- সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার নীতি আলোচনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখতে পারবেন।

বিদেশে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা এখন ব্যাপকহারে প্রয়োগ হচ্ছে। ইউরোপিয়ান দেশসমূহে বিভিন্ন শাক-সবজির মাঠে সমন্বিত দমন ব্যবস্থা চলছে।

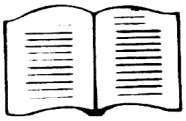

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য বা মূলনীতি হলো পোকা-মাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা।

সমন্বিত বালাই বা আপদ দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management, IPM) উদ্ভিদ সংরক্ষণের একটি পদক্ষেপ যার মাধ্যমে অনেক প্রকারের দমন পদ্ধতি সমন্বয় করে বালাইসমূহ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের (Economic threshold) নিচে রাখা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অল্প পরিমান বালাই শস্য পরিবেশে অবশিষ্টাংশ হিসাবে থাকবে। সামান্য বালাইয়ের আক্রমণে শস্যের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলনে সহায়তা করে। কখনও আক্রমণ কিছুটা বেশি হলে শস্য নিজের ক্ষমতায় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। একটি মাত্র পদ্ধতির দ্বারা বালাই দমন শস্য পরিবেশে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন, ব্যাপকভাবে অনির্বাচিত আপদনাশক ব্যবহারে পোকা-মাকড়ের ধ্বংসের সংগে সংগে প্রাকৃতিক শত্রুও ধ্বংস হয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে থাকে। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য বা মূলনীতি হলো পোকা-মাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা। বিশেষ করে আপদনাশক ব্যবহার ব্যাপারে অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপ (Economic Injury level) বিবেচনায় রেখে দমন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেয়া। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত মাত্রার কম আপদনাশক ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দমন পদ্ধতি যেমন, প্রাকৃতিক, যান্ত্রিক, কৃষি পরিচর্যা, জৈবিক, রাসায়নিক, আইনগত প্রভৃতির মধ্যে যখন যেটি প্রযোজ্য তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ (IPM Components)

শস্য ভিত্তিক (Cropping system) সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। একটি শস্য উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বীজ বপন থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত নানাবিধ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শস্যের বিভিন্ন স্তরে যেমন চারা অবস্থা, বর্ধিত স্তর (Vegetative stage), ফুল ও ফল ধরার স্তরে বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও রোগ আক্রমণ করতে পারে। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় এসব স্তরে যখন বালাই বা আপদ (Pest) দেখা যাবে তখন উপযুক্ত দমন পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান হলো–

১। **পর্যবেক্ষণ ঃ** শস্যক্ষেতে আপদ বা বালাইয়ের আক্রমণ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

২। **জরিপ ঃ** শস্যক্ষেতে আপদ ও তার প্রাকৃতিক শত্রু শনাক্তকরণ এবং এদের সংখ্যার ঘনত্ব জরিপ করা। শস্য পরিবেশে অজীবিয় উপাদানসমূহ (Abiotic factors) জানা।

৩। **দমন নীতি ঃ** শস্যক্ষেতে কখন ও কী পদ্ধতিতে বালাই দমন করতে হবে সে সম্পর্কে জানা এবং সিদ্ধান্ত নেয়া।

সমন্বিত আপদ দমন ব্যবস্থা-পনার প্রধান উপাদান-গুলো হলো পর্যবেক্ষণ, জরিপ, দমন নীতি, দমন পদ্ধতি এবং অজীবিয় উপাদান।

৪। **দমন পদ্ধতি ঃ** বিভিন্ন দমন পদ্ধতি যেমন যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে হাত দ্বারা ধরে মেরে ফেলা, ব্রাস করা, শস্য পরিচর্যার মধ্যে আগাছা তুলে ফেলা, ক্ষেতে পানি দেয়া বা পানি নিষ্কাশন করা, আপদ প্রতিরোধক জাত ব্যবহার করা ইত্যাদি, জৈব দমন পদ্ধতির মধ্যে প্রাকৃতিক শত্রু যথা পরজীবি, পরভূক অথবা রোগ জীবাণু ব্যবহার করা, রাসায়নিক দমন পদ্ধতির মধ্যে নির্বাচিত কীটনাশক, মাকড়নাশক, ছত্রাকনাশকের ব্যবহার।

৫। **অজীবিয় উপাদান ঃ** শস্য উৎপাদন প্রাক্কালে আবহাওয়া যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টি বা আর্দ্রতা, কুয়াশা, বাতাসের গতিবেগ ইত্যাদি বালাইয়ের উপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে তার ভিত্তিতে

দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন প্রতিকূল আবহাওয়ার অনেক আপদ প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব ক্ষেত্রে অন্য কোনো দমন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উদাহরণ

বিদেশে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা এখন ব্যাপকহারে প্রয়োগ হচ্ছে। ইউরোপিয়ান দেশসমূহে বিভিন্ন শাক-সবজির মাঠে সমন্বিত দমন ব্যবস্থা চলছে। এশিয়ার মধ্যে ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, লাউস, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে শাক-সবজি সহ ধান ক্ষেতে এ পদ্ধতিতে আপদ দমন করা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ধান ও শাক-সবজির (বেগুন) উপর সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি চলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থার অনুসরণ করা হবে।

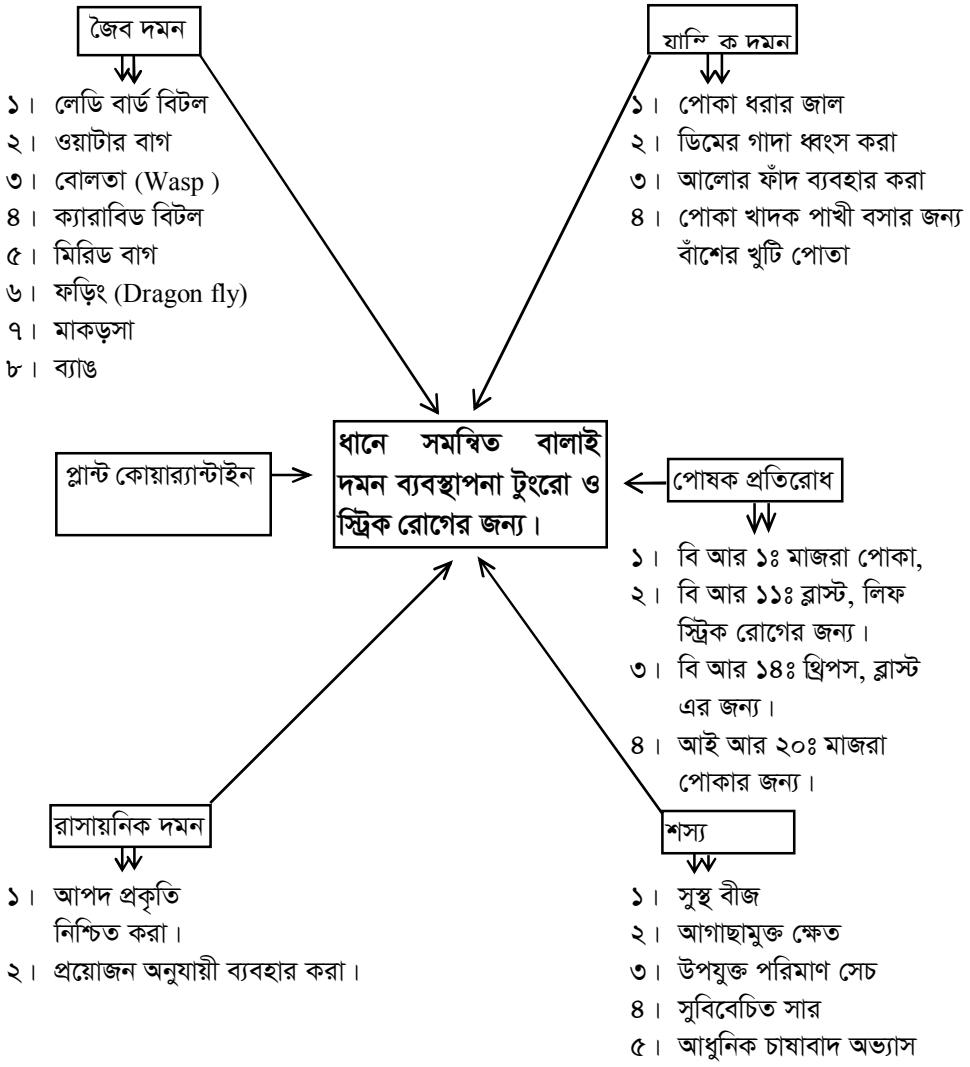

চিত্র ৫.১ বাংলাদেশে ধানে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার (IPM) কার্যক্রম (DAE/FAO)।

অনুশীলন (Activity) ঃ *আপনার এলাকায় ধানক্ষেতে আক্রান্ত মাজরা পোকা দমনের জন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার একটি নমূনা তৈরি করুন।*

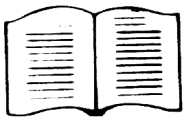

সারমর্ম ঃ সমন্বিত বালাই বা আপদ দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management, IPM) উদ্ভিদ সংরক্ষণের একটি পদক্ষেপ যার মাধ্যমে অনেক প্রকারের দমন পদ্ধতি সমন্বয় করে বালাইসমূহ অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের (Economic threshold) নিচে রাখা হয়। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য বা মূলনীতি হলো পোকা-মাকড় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নয় বরং অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা। শস্য ভিত্তিক (Cropping system) সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। একটি শস্য উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বীজ বপন থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত নানাবিধ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় বালাইসমূহের ঘনত্ব কীরূপ থাকবে?

i) সম্পূর্ণ ধ্বংস করা
ii) অর্থনৈতিক দ্বার প্রান্তের নিচে রাখা
iii) অর্থনৈতিক ক্ষতির ঘনত্বের উপরে যাওয়া
iv) কোনোটাই নয়

খ. জৈব দমন ব্যবস্থার সংগে কোন্ পদ্ধতি সমন্বিত বালাই দমনে ব্যবহৃত হয়?

i) অজৈব দমন ব্যবস্থা
ii) রাসায়নিক দমন
iii) আলোর ফাঁদ ব্যবহার
iv) শস্য প্রতিরোধকজাত

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. IPM একক দমন ব্যবস্থা।
খ. অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্ত ও অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপের অর্থ একই।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. IPM প্রক্রিয়ায় অল্প পরিমাণ ---------- শস্য পরিবেশে থাকতে হয়।
খ. জৈব দমনে লেডিবার্ড বিটল ------- হিসাবে ব্যবহার হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. সমন্বিত আপদ বা বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?
খ. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা কেন গ্রহন করা হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৫ সমন্বিত পোকা দমন পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমন্বিত পোকা দমনে কয়টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত পোকা দমন পদ্ধতি কীভাবে অনুসরণ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

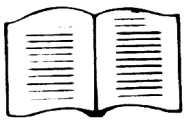

শুধু কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা ধ্বংসের সাথে পোকার প্রাকৃতিক শত্রুও ধ্বংস হয় এবং অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য দমন পদ্ধতির সংগে কীটনাশক ব্যবহার করলে অল্প মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়। এতে পোকা সুষ্ঠভাবে দমন হয় এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। অনেক পোকার জন্য একাধিক দমন পদ্ধতি আছে। এসব পদ্ধতি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করলে পোকার ঘনত্ব অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তের নিচে থাকবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাপে পৌঁছাতে পারবে না এবং শস্যের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এখানে সীমের জাব পোকার (Bean aphid) সমন্বিত দমন পদ্ধতি অনুশীলন করা হলো। পদ্ধতিগুলো সীমের বীজ বপনের পর থেকে সীম তোলা পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সীমের ক্ষেত (চারা অবস্থা)

২। হ্যান্ড লেন্স

৩। কাঁচ (ছোট আকারের)

৪। ব্রাস

৫। কাগজের প্যাকেট অথবা পলিথিন ব্যাগ (ছোট আকারের)

৬। পেট্রিডিস ৪ জোড়া (মাঝারি আকারের)

৭। গবেষণাগারে পালিত লেডি বার্ড বিটল কালচার (পরভূক)।

৮। ম্যালাথিয়ন কীটনাশক এক বোতল (ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি)

৯। হ্যান্ড স্পেয়ার (ছোট আকারের)

১০। পানি ইত্যাদি।

পদ্ধতি

১। জাবপোকার মনিটরিং (জাব পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে কিনা সীম গাছ চারা অবস্থায় পরীক্ষা করুন)।

২। জাবপোকার আক্রমণে আক্রান্ত গাছে পিঁপড়া আসা যাওয়া করে। এটি ভালো করে লক্ষ্য করুন।

৩। জাবপোকার আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ছোট কলোনি সীমের পাতায় দেখা যাবে।

৪। সাধারণ জরিপের মাধ্যমে জাবপোকার সংখ্যা বা ঘনত্ব নির্ণয় করুন। একেই সংগে জাবপোকার শত্রু লেডিবার্ড বিটল এর আবির্ভাব হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ করুন।

৫। আবহাওয়ার অবস্থা যেমন, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, কুয়াশা ইত্যাদি রেকর্ড করুন।

৬। জাবপোকার সংখ্যা অথবা কলোনির উপর ভিত্তি করে দমন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিন।

৭। সীমের ক্ষেতে নিড়ানী দিয়ে আগাছা দূর করুন।

৮। অল্প সংখ্যক জাবপোকা দেখা গেলে যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাতাসহ জাবপোকা হাত দ্বারা তুলে মেরে ফেলুন। এছাড়া ব্রাসিং পদ্ধতি অনুসরণ করা উত্তম। এখানে

ব্রাস দ্বারা জাবপোকা কলোনি থেকে ব্রাস করতে হবে এবং পাতার নিচে একটি কাগজের প্যাকেট বা পলিথিন ব্যাগে জাবপোকা ব্রাস করে ফেলে মেরে ফেলুন। এই পদ্ধতিকে ব্রাসিং বলে।

৯। ক্ষেতে লেডিবার্ড বিটল (পরভূক) দেখা গেলে অল্প সংখ্যক এই পোকার লার্ভা বা শুককীট গবেষণাগার থেকে পেট্রিডিসে ধরে নিয়ে আক্রান্ত সীম গাছে ছেড়ে দিন। এই পদ্ধতির নাম জৈবিক দমন (Biological control)। যদি জাবপোকার ঘনত্ব কম থাকে অর্থাৎ প্রতি সীম গাছে ৫০০ জাবপোকা অথবা কম থাকে তখন প্রতি গাছে ১৫টি লেডিবার্ড বিটলের লার্ভা ছেড়ে দিন।

১০। যদি জাবপোকার আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে (প্রতি গাছে ১০০০ এর বেশি জাবপোকা) তখন লেডিবার্ড বিটলের লার্ভা ছাড়ার পর ম্যালাথিয়ন কীটনাশক প্রয়োগ করুন। এখানে প্রতি আক্রান্ত গাছে ১৫টি লার্ভা ছেড়ে দিন এবং পরে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ০.০০২% মাত্রায় স্প্রে করুন।

১১। বেশি বৃষ্টিপাতে ও ঘন কুয়াশাতে জাবপোকা সহজে মারা যায়। এরূপ অবস্থায় কোনো দমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

সতর্কতা

১। কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে হাতে গ্লোবস পড়ে নিন।

২। কীটনাশকের মিশ্রণ যেন শরীরের কোনো অংশে না লাগে।

৩। শরীরের কোথাও মিশ্রন লাগলে সংগে সংগে পানি দিয়ে ধুঁয়ে ফেলুন।

৪। লেডিবার্ড বিটলের লার্ভা সাবধানে ধরবেন যেন আঘাত না পায়। আঘাতপ্রাপ্ত লার্ভা জাবপোকার জৈবিক দমনে কাজ করে না।

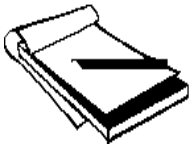

চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ৫

১। পোকা দমনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।

২। প্রাকৃতিক দমন ও কৃত্রিম দমনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৩। আইনগত নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝেন?

৪। পাঁচটি জৈব কীটনাশকের বর্ণনা দিন।

৫। কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতিগুলো কী কী? তার মধ্যে যে কোনো তিনটির বর্ণনা দিন।

৬। কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতা বর্ণনা করুন?

৭। সমন্বিত দমন ব্যবস্থা শস্যের কোন্ অবস্থায় করতে হয় এবং প্রথমে পোকার কী দেখতে হয়?

৮। জাবপোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতিতে জৈবিক দমন ব্যবস্থা কীভাবে করতে হয়?

৯। কোন্ কীটনাশক কীভাবে জৈবিক দমনের সংগে জাবপোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতিতে অনুসরণ করা যায়?

উত্তরমালা– ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১।	ক. i	খ. iii
২।	ক. স	খ. মি
৩।	ক. এক প্রকার পোকা	খ. কীটনাশক
৪।	ক. প্রাকৃতিক দমন কার্যকরী না হলে	খ. শস্যক্ষেতে নিয়মিত পরিচর্যা করা

পাঠ ৫.২

১।	ক. iv	খ. i
২।	ক. স	খ. স
৩।	ক. ডায়াজিনন	খ. ম্যালাথিয়ন
৪।	ক. অজৈব কীটনাশক	খ. জৈব ক্লোরিন

পাঠ ৫.৩

১।	ক. iii	খ. i
২।	ক. মি	খ. স
৩।	ক. আকর্ষক	খ. তৎক্ষনাৎ পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে ফেলা
৪।	ক. পোকার প্রকৃতি ও স্থানীয় অবস্থা	খ. লিখিত নির্দেশাবলী

পাঠ ৫.৪

১।	ক. ii	খ. i
২।	ক. মি	খ. মি
৩।	ক. বালাই	খ. পরভূক
৪।	ক. একের অধিক দমন ব্যবস্থা	খ. শস্যের পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য